ডাব্লিউটিও’র কবলে বাংলাদেশ

লিখেছেন **জয়ন্ত আচার্য**

বিশ্বায়নের নামে উন্নত বিশ্ব ক্রমেই অনুন্নত দেশগুলোকে তার নিয়ন্ত্রণাধীন করে ফেলছে। উন্নয়নশীল ও অনুন্নত বিশ্বের কৃষি, শিল্প, খনিজসম্পদ জীববৈচিত্র্য, মেধাস্বত্বে তারা আধিপত্য বিস্তার করেই চলছে। উন্নত বিশ্বের আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টায় সর্বাত্মক সহযোগিতা করছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা। World Trade Organization। অথচ বিশ্বায়ন ও বাণিজ্য উদারীকরণের গতিকে ত্বরান্বিত করে উন্নত, উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশসমূহের সক্রিয় ও অর্থবহ অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে সকলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা গড়ে ওঠে। ’৪৭ সালের গ্যাট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ভিত রচিত হয়। প্রথম গ্যাট চুক্তিতে ২৩টি দেশ স্বাক্ষর করে। চুক্তিটি তিনটি নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। বাণিজ্যে থাকবে না কোনো উন্নত, অনুন্নত দেশের মধ্যে বৈষম্য। বাণিজ্য সম্পর্ক হবে বহুপাক্ষিক। থাকবে সকলের জন্য সমান সুযোগ। গ্যাটের অধীনে এরপর আটবার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রতিটি চুক্তি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, চুক্তির কারণে লাভবান হয়েছে উন্নত দেশ। উন্নয়নশীল দেশের উৎপাদিত পণ্যের ওপর আরো নিয়ন্ত্রণ তাদের প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ধনী দেশে উন্নয়ন হয়েছে ত্বরান্বিত। চুক্তির বিধিনিষেধ উন্নয়নশীল দেশের বাণিজ্য গতি প্রবাহ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সর্বশেষ গ্যাট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে ১৯৮৬ সালে উরুগুয়ে। ’৮৬ সালে অনুষ্ঠিত এই রাউন্ডে ১৬৬ দেশ অংশ নেয়।

DEMOCRACY
WTO

১৯৯০ সালে ব্রাসেলসে উরুগুয়ে রাউন্ডের বৈঠক কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই ভেঙে যায়। তৎকালীন গ্যাট-এর ডাইরেক্টর জেনারেল আর্থার ডাঙ্কেল (Arthur Dunkel) নতুন করে সভা অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেন। উরুগুয়ে রাউন্ডের আলোচনা ও ঝগড়া বিবাদের বিষয়গুলোর ওপর ভিত্তি করে সকলকে এক জায়গায় আনার জন্য একটি খসড়া প্রণয়ন করেন। তার এই খসড়া প্রস্তাবটি ছিল প্রায় ৪৫০ পৃষ্ঠায়। আর্থার ডাঙ্কেল ১৯৯১ সালের ২০ ডিসেম্বর সভা ডেকে তার খসড়া প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। তখন ফ্রান্স, জার্মানির মতো শিল্পোন্নত দেশসমূহের বিরোধিতার ফলে সমস্ত উদ্যোগ নস্যাৎ হয়।

পরবর্তীকালে ডাঙ্কেল তার প্রস্তাবটি সকল দেশের কাছে পাঠান। তিনি বলেন, ১৯৯২ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে সব দেশকে এই খসড়া চুক্তিতে সই করতে হবে। তার বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যে অবশ্য কেউই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি। এই খসড়া নিয়ে বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য দরকষাকষির হিসাব-নিকাশ চলে। অবশেষে ১৯৯৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর সকলে মতৈক্যে পৌঁছায় সামান্য পরিবর্তন ও সংশোধনের মাধ্যমে ডাঙ্কেল প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯৯৪ সালের ১৫ এপ্রিল এক সম্মেলনের মাধ্যমে উরুগুয়ে রাউন্ডের গ্যাট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১২৪টি দেশ এতে অংশগ্রহণ করে। এই চুক্তি ঐ বছরের ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয়। এ চুক্তির মাধ্যমে গ্যাট ১৯৯৫ সাল থেকে বিলুপ্ত হয়। তার স্থলাভিষিক্ত হয় ‘বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা’ নামের এক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা।

গ্যাট ভেঙে WTO গড়ে উঠলেও প্রতিষ্ঠানটির উন্নয়নশীল বিশ্বের স্বার্থে কাজ করার আচরণের পরিবর্তন হয়নি। বিশ্বায়নের নামে WTO উন্নয়নশীল বিশ্বের সকল সম্পদের ওপর আধিপত্য বিস্তারে তৎপর। এর ফলে অনুন্নত দেশগুলো আরো শৃঙ্খলিত হচ্ছে। আমাদের দেশকেও বিশ্বায়নের নামে ক্রমেই WTO অক্টোপাসের মতো

আটকে ধরছে। তারা সাহায্যের নামে, বাণিজ্য উদারীকরণের প্রলোভনের জালে ফেলে নানা ধরনের চুক্তিতে বাংলাদেশকে আবদ্ধ করছে। সরকারগুলো কখনো বুঝে, কখনো বা না বুঝেই চুক্তিতে স্বাক্ষর করছে। অথচ এ চুক্তিগুলো সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে না সংসদে। জনগণ থাকছে পুরো অন্ধকারে।

আগামী ১০ থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর মেক্সিকোর কানকুনে অনুষ্ঠিত হবে ডব্লিউটির পঞ্চম মিনিস্টেরিয়েল কনফারেন্স। এ কনফারেন্সে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের স্বার্থ রক্ষার জন্য ৩১ মে থেকে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে এলডিসিভুক্ত দেশগুলোর কনফারেন্স। ইতিমধ্যে অনুন্নত ৩৮টি দেশ এ কনফারেন্সে অংশগ্রহণের বিষয় নিশ্চিত করেছে। এলডিসি সম্মেলন প্রসঙ্গে বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী ২০০০কে বলেন, ‘আগামীতে ডব্লিউটিওর মেক্সিকোর কানকুনের মিনিস্টিরিয়াল কনফারেন্সে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহ যাতে অভিন্নভাবে অবস্থান নিতে পারি, এ কারণেই এই কনফারেন্স।’

তবে বিশ্লেষকেরা বলছে, কানকুনের সম্মেলনেও অনুন্নত দেশগুলোর জন্য কোনো সুখবর বয়ে আনবে না। বরং আরো বিধি নিষেধের জালে অবদ্ধ হবে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কাঠামো : ধনী দেশের আনুকূল্যে

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হচ্ছে মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন। সদস্য দেশসমূহের বাণিজ্য মন্ত্রীরা এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির অধীনে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা গঠিত হওয়ার পর থেকে চারটি মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথমটি অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বরে সিঙ্গাপুরে। দ্বিতীয়টি অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৯৯৮-এর মে মাসে জেনেভায়। তৃতীয়টি অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৯৯৯ সালের নবেম্বরে সিয়াটলে। চতুর্থ মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে কাতারের রাজধানী দোহায়।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে বাণিজ্য সংঘাত মেটানোর দায়িত্ব পালন করা। তবে দৈনন্দিন কাজের জন্য একটি সাধারণ পরিষদ রয়েছে। এরই পাশাপাশি আর দু’টি বিভাগ রয়েছে। মামলা মীমাংসার বিভাগ। বাণিজ্য নীতি পর্যালোচনা বিভাগ।

মামলা মীমাংসা বিভাগে একটি আপিল বিচারকমন্ডলী গঠিত হয়। এই সদস্যেরা কোনো বিশেষ দেশের সরকারে প্রতিনিধিত্ব করবেন না। বিরোধ নিষ্পত্তি বিভাগ সদস্যদের বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তির আলাপ-আলোচনার ওপর গুরুত্ব দেয়। যদি কোনো সদস্য দেশ কোনো আপত্তি উত্থাপন করে তবে ত্রিশ দিনের মধ্যে যার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে সে দেশকে আলাপ-আলোচনা শুরু করতে হবে। ষাট দিনের মধ্যে যদি বিরোধ নিষ্পত্তি না হয় বা অভিযুক্ত দেশ যদি আলাপ-আলোচনায় না বসে, তবে আপত্তি উত্থাপনকারী দেশ একটি প্যানেল গঠনের আহ্বান জানাতে পারে। এছাড়া অভিযোগকারী পার্টিগুলো অন্যভাবেও সংকট নিরসন করতে পারে। যেমন- সমঝোতা ও সালিশের মাধ্যমে। যদি প্যানেল প্রতিষ্ঠা করা হয়, তবে প্যানেল প্রতিষ্ঠার বিশ দিনের মধ্যে উভয় পক্ষকে একটা টার্মস অব রেফারেন্সে সম্মত হতে হবে। এ বিশ দিনের মধ্যে যদি প্যানেল গঠনে ঐকমত্য না হয় তখন ডাইরেক্টর জেনারেল সিদ্ধান্ত নেবে। প্যানেল সাধারণত তিন জন ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত হয়। তিন ব্যক্তির প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে তাদের বিবদমান কোনো দেশেরই নাগরিক হওয়া চলবে না। এই উদ্দেশ্যে গ্যাট সেক্রেটারিয়েট একদল অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের নামের তালিকা সংরক্ষণ করে। এই প্যানেল সাধারণত ছয় মাসের কাজ সম্পন্ন করবে। জরুরি প্রয়োজনে তিন মাসেও কাজ শেষ করতে পারে। প্যানেল তার রিপোর্ট সদস্যদের মধ্যে বিতরণের ২০ দিনের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি বিভাগ (DSB) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কথা ভাবতে পারে। ইস্যু করার ষাট দিনের মধ্যে যদি বিবদমান কোনো পক্ষের আপত্তি না থাকে বা বিরোধ নিরসন পরিষদ (DSB) সর্বসম্মতিক্রমে রিপোর্টটি প্রত্যাখ্যান না করে তবে তা গ্রহণ করা হবে। রিপোর্ট গৃহীত না হলে আপত্তি উত্থাপনকারী দেশ আপিলের ঘোষণা দিতে পারে। আপিল সংস্থা গঠিত হবে সাত সদস্যের সমন্বয়ে। আপিল বিভাগ নোটিফিকেশনের ষাট দিনের মধ্যে তার রিপোর্ট পেশ করবে। বিরোধ নিষ্পত্তি বিভাগ আপিল বিভাগের রিপোর্ট গ্রহণ করবে সদস্যদের মধ্যে রিপোর্টটি বিতরণের ত্রিশ দিনের মধ্যে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ বিনা শর্তে রায় মেনে নিতে বাধ্য থাকবে। যদি না বিরোধ নিষ্পত্তি পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে রিপোর্টটি প্রত্যাখ্যান করে। কেউ রিপোর্ট বাস্তবায়ন করতে না চাইলে অন্য দেশ জরিমানা ধার্য বা কনসেশন বাতিল করার আবেদন করতে পারে। রায় বাস্তবায়নের সময়কালের ত্রিশ দিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর বিরোধ নিষ্পত্তি বিভাগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

‘উন্নত বিশ্বে কৃষিতে ৫০% ভর্তুকি দেয়া হয়। আমাদের কৃষিতেও ভর্তুকি দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে’

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

প্রতিমন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়

সাপ্তাহিক ২০০০ : হাইব্রিজ ধান চাষ করায় কৃষির জীববৈচিত্র্য নষ্ট হচ্ছে। দেশের কৃষির জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য সরকার কোনো উদ্যোগ নিয়েছে কি?

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর : আসলে হাইব্রিড আমাদের দেশে এখন জনপ্রিয় না। আমরা সেভাবে হাইব্রিড চাষও করছি না। হাইব্রিড নিয়ে আমাদের বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। আসলে আমরা বীজটা যখন নিজেরা উৎপাদন করতে পারবো তখন হাইব্রিড বেশি মাত্রায় চাষ করবো।

২০০০ : আসলে আমি কৃষির জীববৈচিত্র্যের কথা বলছি।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর : আপনাকে মনে রাখতে হবে আমাদের বাড়তি জনসংখ্যা আছে। আমাদের জনগণের খাদ্যের নিরাপত্তা বিধান করতে হবে। এ কারণে কিছু তো হাইব্রিড ধান উৎপন্ন করতে হবে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর জন্য। তবে আমরা আমাদের গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে বলেছি কৃষির জীববৈচিত্র্য যাতে রক্ষা করা সম্ভব হয়, তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের। আমরা চাই আমাদের কৃষির জীববৈচিত্র্য টিকে থাক।

২০০০ : ডব্লিউটিও’র মতো প্রতিষ্ঠানগুলো কৃষিতে ভর্তুকি বন্ধের কথা প্রায় বলে। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর : কৃষিকাজ আসলে লাভজনক পেশা নয়। এ কারণে কৃষিতে সবসময় সরকারি সুযোগ-সুবিধা দেয়ার ব্যাপারটা ছিল। উন্নত দেশগুলোতে কৃষির ওপর ভর্তুকি ৫০% দেয়া হয়। আমরা কৃষিতে তেমন ভর্তুকি দেইনি। সারের ওপর সামান্য ভর্তুকি দেয়া হয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, কৃষিতে ভর্তুকির প্রয়োজন রয়েছে। বীজের ক্ষেত্রে, শস্য দ্রব্য উৎপাদনের পর প্রক্রিয়াজাতকরণে।

‘ডাব্লিউটিও’র কোন কিছুই গোপন নেই’

আমির খসরু মাহমুমদ চৌধুরী

মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

ডব্লুউটিও কার্যক্রমে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া রয়েছে বলে বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু স্বীকার করেন। তিনি ২০০০কে বলেন, ‘এমন বলা হয় ডব্লুউটিওর যে সুযোগ তা উন্নত বিশ্বের দেশগুলো নিয়ে নিচ্ছে। এ কারণেই অনুন্নত দেশগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। গ্যাটসের সময়ও অনুন্নত দেশগুলো তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কথা বলেছে। আমরা ঢাকায় এলডিসি সম্মেলনের আয়োজন করছি। মূলত যাতে আগামী ডব্লউটিওর কানকুন সম্মেলনে অভিন্নভাবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর স্বার্থ রক্ষার জন্য কথা বলতে পারি। তবে তিনি বলেন, ডব্লুউটিরও কাছ থেকে বাংলাদেশ সব সময় নিজস্ব স্বার্থ আদায়ের চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ বেশকিছু সুযোগ পেয়েছে। নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে, কানাডা, জাপানের কাছ থেকে অধিকাংশ পণ্যের কোটামুক্ত সুবিধা পেয়েছি। ডব্লুউটিওর সঙ্গে চুক্তিগুলো কেন প্রকাশ করা হয় না- এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আসলে গোপন করার কিছু নেই। এখন ইন্টারনেট হাইওয়ের মাধ্যমে সব জানা যায়। তিনি বলেন, আমরা ডব্লুউটিওর সঙ্গে আলোচনাগুলো সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জানিয়েছি। আগামীতে এ ধারা অব্যাহত থাকবে। আগামী কানকুনের সম্মেলনে বাংলাদেশসহ অনুন্নত দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা হবে।

PHILIPPINES
OUST US-BACKED ESTRADA REGIME
Down with U.S. Imperialism

ডাব্লিউটিও’র আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে সারা বিশ্ববাসী প্রতিবাদমুখর

গ্রহণের আবেদনে সম্মতি প্রকাশ করবে।

কাগজে-কলমে এটা থাকলেও বাস্তবে কিন্তু এমনটি ঘটছে না। ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত সরকার আমদানির পরিমাণের ওপর কিছু বিধি নিষেধ আরোপ করেছে বলে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার Apellate Bodyতে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। ভারতের যুক্তি হচ্ছে এই আমদানি নিয়ন্ত্রণ তার দেশের ব্যালেন্স অব পেমেন্ট অর্থাৎ বাণিজ্য ঘাটতি মেটাবার জন্যে প্রয়োজন।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অধীন এমন কোনো নিয়ম নেই যে কোনো দেশ তার নিজ দেশের উন্নয়ন নীতি গ্রহণ করতে পারবে না। কাজেই যদি কোনো দেশ মনে করে তার দেশের উন্নয়নের জন্যে আমদানির ওপর সংখ্যা ও পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ দরকার তাহলে সে অবশ্যই তা করতে পারে। অথচ এখানে আইএমএফ ছিল বাদী। তারা বাণিজ্য উদারীকরণ নীতির আওতায় একমাত্র শর্ত মনে করে আমদানি বাড়ানো। ফলে অ্যাপিলেট বডি তাদের বক্তব্য শোনার পর রায় দিলো যে ভারত আমদানির ওপর যে পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে তা দূর করতে হবে।

চক্রবর্তী রাঘবনের প্রণীত এক প্রতিবেদনে জানা যায় যে, সেপ্টেম্বর মাসে ডিস্পিউট সেটেলমেন্ট বডি ভারতের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ হচ্ছে যে, তারা ব্যালেন্স অব পেমেন্টের জন্যে আমদানির ওপর পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার নীতি গ্রহণ করেছে।

মামলা নিষ্পত্তি বিভাগের প্রক্রিয়া বিশেষণ করলে বোঝা যায়, ডব্লিউটিও যে তারা কেবল উন্নয়নশীল দেশগুলোর অধিকার হরণের জন্যে সব সময় তৎপর। এই ঘটনা থেকে আরো বোঝা যায় যে, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা উন্নত বিশ্বের পক্ষে কাজ করছে। যে কোনো অজুহাতে তৃতীয় বিশ্বের অধিকার হরণ করাই তাদের প্রধান কাজ।

বিভিন্ন রাউন্ডে ডব্লিউটিও নানা কৌশলে অনুন্নত দেশগুলোর কাছ থেকে অনৈতিক চুক্তিতে সই করিয়ে নিচ্ছে বলে অভিযোগ আছে। মেধাস্বত্ব চুক্তি। জিএসএফ। জিএটিএস।

রুলস অব অরিজিন চুক্তি : হারাতে হবে পোশাক শিল্প

বাংলাদেশে পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে Generalized System of Preference (GSP) স্কিমের সুবিধা ভোগ করে। বাংলাদেশকে ইইউ-এর জিএসপি সুবিধা পেতে হলে রুলস অব অরিজিন শর্তাবলী মেনে চলতে হবে। ইইউ রুলস অব অরিজিন উভেন পোশাকের বেলায় একটি দুই ধাপ বিশিষ্ট (সুতা থেকে কাপড়, কাপড় থেকে পোশাক) আর নিট পোশাকের বেলায় তিন ধাপের রূপান্তর (তুলা থেকে সুতা, সুতা থেকে কাপড় এবং কাপড় থেকে পোশাক) চুক্তির শর্ত দেয়া আছে। যেহেতু এখনো পর্যন্ত সুতা কাটা ও বয়নে বাংলাদেশের নিজস্ব ক্ষমতা সীমিত, সেজন্য রুলস অব অরিজিন চুক্তির ফলে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প সমস্যায় পড়বে ইইউ-এর বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে। বাংলাদেশ প্রায় ৯০% উভেন কাপড় এবং ৬০% নিটেড কাপড় আমদানি করে। ফলে পোশাক শিল্পের নিশ্চিত ইইউ-এর বাজার হারাতে হবে বাংলাদেশকে। এ জন্য ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ স্থাপনে গুরুত্বারোপের পাশাপাশি সময়সীমা বাড়ানোর চেষ্টা চালাতে হবে। এজন্য এক্ষেত্রে প্রচুর বিনিয়োগের প্রয়োজন।

GATS : বেসরকারি খাতে ছেড়ে দিতে হবে সেবা খাত

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অধিকাংশ চুক্তিই শিল্পজাত পণ্য বিনিময় সম্পর্কিত GATS-এর মাধ্যমে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিধিমালা, সেবাখাতেও সম্প্রসারিত। যেখানে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ব্যাংকিং থেকে খুচরা দোকান স্থাপন পর্যন্ত। শিল্পোন্নত দেশসমূহের অর্থনীতিতে সেবাখাতের অংশ দুই-তৃতীয়াংশ। বিশ্ব অর্থনীতির অর্ধেক। সেবাখাতের বাণিজ্য বিশ্ব বাণিজ্যের এক-চতুর্থাংশ। যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

GATS চুক্তিতে একটি ফ্রেমওয়ার্ক বা কাঠামো স্থির করা হয়েছে যাতে চুক্তির মৌলিক বাধ্যবাধকতাগুলো সকল সদস্য রাষ্ট্রের ওপর সমভাবে প্রয়োগ করা যায়। Most Favoured Nation (Article II)-এর বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী সকল Trading partner ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে সমান সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। এর সময়সীমা দশ বছর। পাঁচ বছর পর পর পর্যালোচনা করে তা ঠিক করতে হবে। এ চুক্তিতে বলা হয়েছে যে, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রযুক্তি ও তথ্য চ্যানেলে প্রবেশের সুযোগ দিয়ে, বাণিজ্য উদারীকরণের

মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সেবা বাণিজ্য অধিকতর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া হবে। যেসব অভ্যন্তরীণ বিধি-নিষেধ সেবা বাণিজ্যকে প্রভাবিত করে সেগুলো ধীরে ধীরে অপসারণ করতে হবে। প্রয়োজনে দ্রুত প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। চুক্তিতে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দায়িত্ব, লাইসেন্স বা সনদপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে যোগ্যতার একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানদন্ড মেনে চলার দায়বদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে।

National Treatment এবং Market Access-এ দুটো ধারা অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ বাজারে বিদেশী সেবা ও সেবা প্রদানকারীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চুক্তিবদ্ধ দেশগুলো সব ধরনের বাধা দূর করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। যেমন কোনো দেশ সেবা বাণিজ্যের মোট সেবা প্রদানকারী কোম্পানির সংখ্যা বা সেবা বিধানদের মূল্য সীমা বা সেবা সংস্থায় কর্মীদের সংখ্যা বেঁধে দিতে পারবে না। একইভাবে সেবা সংস্থা সংক্রান্ত আইনি বিধি-নিষেধ, যা বিদেশী পুঁজি বা বিদেশী বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ নিয়ন্ত্রণ করে তা দ্রুত দূর করতে হবে। চুক্তির অধীনে (আলোচনা সাপেক্ষে) সেবাখাতে জনশক্তি স্থানান্তরের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি প্রদানের বিধি রয়েছে। ব্যাংকিং খাত ও টেলিযোগাযোগ খাতে এ চুক্তির বলে বিদেশী বিনিয়োগকারীরাও দেশীয় উদ্যোক্তাদের মতো সমান সুযোগ পাবে।

এ চুক্তির অধীনে বিভিন্ন সেবাখাত যেমন ব্যাংক, বীমা, সংবাদ মাধ্যম, চলচ্চিত্র ইত্যাদি সেবাখাতসমূহের একদেশ থেকে অন্যদেশে ব্যবসা করার বিধি বিধান রয়েছে। বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ-এর কাঠামোগত সমবায় কর্মসূচি বা স্যাপের মাধ্যমে দেশে দেশে বেসরকারিকরণের ডামাডোল চলছে দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে। তার আওতায় সেবাখাত, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ব্যাংকিং ইত্যাদিকেও বাণিজ্যের বিষয়ে পরিণত করা হয়েছে। সেবা এখন সম্পূর্ণভাবে একটি ‘পণ্য’। ডব্লিউটিও-তে এ ব্যবস্থার বৈশ্বিকীকরণ ঘটলো। ফলে অন্য যে কোনো খাতের মতো সেবাখাতেও বৈদেশিক বিনিয়োগ ও বাণিজ্য হবে। যে কোনো বহুজাতিক কোম্পানি চুক্তিভুক্ত যে কোনো দেশেও সময়ে সুবিধামতো বিনিয়োগ ও বাণিজ্য করতে পারবে। যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানি সরবরাহ ও বিদ্যুতের মতো বিভিন্ন জাতিগঠনকারী খাতেও। এর সঙ্গে যুক্ত হবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অন্যান্য চুক্তির সুবিধা যেমন TRIPS (মেধাস্বত্ব অধিকার), ফলে গরিব জনগণ এতদিন রাষ্ট্রের কাছ থেকে যে প্রাথমিক ও মৌলিক সেবাগুলো ন্যূনতম পরিমাণে হলেও পেত, চুক্তি কার্যকর হলে সেই সুবিধা থেকে জনগণ হবে বঞ্চিত।

‘বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের নামে অনুন্নত দেশগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে’

তোফায়েল আহমেদ

সাবেক বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী

আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ ২০০০কে বলেন, ‘উরুগুয়ে রাউন্ড অ্যাগ্রিমেন্ট দীর্ঘ আট বছর পরিশ্রমের পর মারাকাসে ’৯৪ সালে অনুমোদিত হয় গ্যাটের মিটিংয়ে। সেখান থেকেই গ্যাট পরিবর্তিত হয়ে ডব্লিউটিও রূপান্তরিত হয়। আসলে উরুগুয়ে রাউন্ড করার সময় স্বল্পোন্নত দেশের অভিজ্ঞতার অভাব ছিল। কি হচ্ছে আসলে তারা জানতোও না। উন্নয়নশীল দেশগুলোও বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে পারেনি। কিন্তু যারা করেছে, উন্নত দেশ তারা ঠিকই বুঝেছে তারা কি করতে যাচ্ছে। আমি বাণিজ্যমন্ত্রী হবার পর তিনটি ডব্লিউটিও মিনিস্টিরিয়ান কনফারেন্সে যোগদান করেছি। আমি সিঙ্গাপুরে ১৩ ডিসেম্বর ’৯৬-এর ফার্স্ট মিনিস্টিরিয়ান কনফারেন্সে যোগদান করেছি। তখন আমি স্বল্পোন্নত ৪৮টি দেশের সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করেছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘সিঙ্গাপুরে রাউন্ডে ৪৮টি স্বল্পোন্নত দেশে আমি নেতৃত্ব দিয়েছিলাম। কোর কমিটির যখন মিটিং হয় তখন আমি উত্থাপন করেছিলাম স্পেশাল ডিফারেন্সিয়াল অ্যারেজমেন্ট। সেটা আমাদের জন্য করার, তা বাস্তবায়নের। উন্নত দেশ সেদিন আমার প্রস্তাবে বাধা দিয়েছে। আমি বলেছিলাম, এ মিটিংয়ে অ্যাগ্রিমেন্ট বাস্তবায়িত না হলে আমরা ঘোষণাপত্রে সই করবো না। এরপর উন্নত বিশ্বের দেশগুলো আমার সঙ্গে নেগোসিয়েশনে আসে। তারা কোটা ফ্রি ও টিউটি ফ্রি ক্লোজ সংযোগ করে। আমরা এখন উন্নত কিছু দেশ থেকে এ সুযোগ পাচ্ছি। তিনি বলেন, উন্নত বিশ্বে দেশগুলো ডব্লিউটিও’র মাধ্যমে যা নেবার নিয়ে গেছে। এখন দেবার কথা আসছে। এখন তাদের আপত্তি। আমার তিনটি মিনিস্টিরিয়াল সম্মেলনের অংশগ্রহণ করার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি ডব্লিউটিও বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের নামে অনুন্নত দেশগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

WTO প্রভাব : এদেশের কৃষিখাত ধ্বংসের পথে

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। বাংলাদেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (Gross Domestic Product) প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ আসে কৃষি থেকে। জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষির এ অবদান অন্যান্য এশীয় দেশগুলোর চাইতে বেশি (পাকিস্তানের জিডিপি-এর ২৫%, থাইল্যান্ডের ১০%, ফিলিপাইনের ২২% এবং দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহের জিডিপির ৩০% আসে কৃষি থেকে। এ দেশের শতকরা ৭০ জনেরও বেশি মানুষ গ্রামে বাস করে যাদের প্রধান পেশা কৃষি)।

দ্রুত নগরায়ন, আবাসস্থল ও গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণের ফলে প্রতি বছর প্রায় ৮২,০০০ হেক্টর চাষের জমি কমে গেলেও কৃষিতে স্বনির্ভরতা অর্জন এখন আর অসম্ভব ব্যাপার নয়।

গ্যাট চুক্তির অষ্টম রাউন্ড অর্থাৎ উরুগুয়ে রাউন্ডে প্রথমবারের মতো কৃষির অন্তর্ভুক্তি ঘটে। তার মানে এই নয় যে বিশ্ব বাণিজ্যে কৃষিজ পণ্যের বিকিকিনি ঘটেনি। উন্নত দেশসমূহ তাদের অভ্যন্তরীণ কৃষি নীতিকে আড়াল করার জন্যই কৃষিজাত সামগ্রী বাজারজাত করে তারা বিস্তর মুনাফা কামিয়েছে। শিল্পখাতের আয়কৃত অর্থে আধুনিকীকরণ করেছে পুরো কৃষি ব্যবস্থা। প্রচুর ভর্তুকি দিয়ে কৃষিকে বৃহৎ বৃহৎ খামারে পরিণত করেছে, ফলে উৎপাদনও বেড়েছে ঢের। অথচ কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচ ও বিক্রয় মূল্যের মধ্যে রয়েছে বিশাল ফারাক।

শিল্পোন্নত ও অনুন্নত দেশের ধান উৎপাদন খরচের ব্যবধান খুবই বেশি। যদিও অভ্যন্তরীণ বাজারে ধানের মূল্য তুলনামূলক হারে বেশি কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে এর মূল্য অবশ্যই অনুন্নত দেশের মূল্যমানের কম। এতে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, শিল্পোন্নত দেশের কৃষি ব্যবস্থা সার্বিকভাবেই ভর্তুকি নির্ভর। এভাবে ভর্তুকি দিয়ে নিজেদের কৃষি ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার চাইতে উন্নত বিশ্বের বড় যে তাড়না ছিল তা হল অনুন্নত বিশ্বের কৃষিকে কোনো না কোনোভাবে ঠেকানো।

আঙ্কটাডের এক রিপোর্টে দেখা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় জোট আর জাপান মিলে বছরে ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রাষ্ট্রীয় ভর্তুকি কৃষিতে প্রদান করে। শিল্পোন্নত দেশগুলোর জোট OECD ১৯৮৮ সালে একটি হিসাবে দেখায় যে, ১৯৮৪-৮৬ সালের মধ্যে কৃষিতে সবকিছু মিলিয়ে টাকা ফেরত গেছে ১৭৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। রাষ্ট্রীয় কোষাগার এই খরচ কুলিয়ে উঠতে পারছে না বিধায় কৃষিতে গ্যাট-এর অষ্টম রাউন্ডে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আলোচনায় সম্পৃক্ত করে। এখানে AOA চুক্তি সম্পন্ন হয়। এর ফলে যে সমস্ত দেশ কৃষিতে ব্যাপক হারে ভর্তুকি প্রদান করছে তাদের ২০% ভর্তুকি কমিয়ে ফেলতে বলা হয়।

চুক্তিতে বলা হয়, উন্নত দেশগুলো তাদের কৃষিপণ্যের শতকরা ২১ ভাগ ভর্তুকির মাধ্যমে রপ্তানি করতে পারবে। অনুন্নত দেশ তাদের

কৃষিপণ্যের শতকরা ১৪ ভাগ ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে রপ্তানি করতে পারবে।

একারণে কৃষিতে আমাদের টিকে থাকা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে।

বর্তমানে (১৯৯৪ সালে) বাংলাদেশে প্রতি টন ধানের উৎপাদন খরচ ১৩৮ ডলার এবং অভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রয় মূল্য প্রতি টন ১৮০ ডলার। কৃষি খাতে যদি রাষ্ট্রীয় ভর্তুকি প্রত্যাহার করা হয় তবে উৎপাদন খরচ বাড়বে নিশ্চিত; এখনো এ ধরনের প্রভাব কৃষিতে লক্ষণীয়। ফলে প্রান্তিক চাষী, বাংলাদেশের শতকরা ৭০ ভাগ লোক, কৃষিতে উৎসাহ হারাবে। শুরু হবে কৃষি শিল্পায়ন, একক প্রজাতির শস্যের আবাদ, অধিক ফলনের আশায় বিপুল সার কীটনাশক প্রয়োগ, এমনকি সর্বনাশা হাইব্রিড শস্যের আবাদে বিনষ্ট হবে বাংলাদেশের প্রাচীন ঐতিহ্য পারিবারিক কৃষি ব্যবস্থা।

বুদ্ধিজাত সম্পত্তি ও প্রাণ বৈচিত্র্যে আধিপত্য

ডব্লিউটিও কৌশলে অনুন্নত দেশগুলোর কাছ থেকে ট্রিপস চুক্তি (TRIPS) স্বাক্ষর করে নিয়েছে

এর অর্থ হল বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বুদ্ধিজাত সম্পত্তির অধিকার। এই চুক্তিতে নতুন যে বিষয়টি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসে তা হলো বুদ্ধিজাত সম্পত্তি। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাদের বুদ্ধি বা মেধা খাটিয়ে যদি কোনো নতুন সামগ্রী বা ডিজাইন বা কলাকৌশল আবিষ্কার ও সৃষ্টি করে তবে সেগুলো বুদ্ধিজাত সম্পত্তি হিসেবে ধরা হয়। শুধু তাই নয়, জমি ও প্রকৃতির বিভিন্ন উপদানসমূহও মালিকানা, দখলদারিত্ব, অধিকার প্রভৃতি আইন করে বাণিজ্যে সম্পৃক্ত করা হয়েছে ট্রিপস চুক্তির মাধ্যমে।

একটা সময় ছিল যখন বিশ্বাস করা হতো বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ মানুষের সাধারণ সম্পত্তি, তাতে ছিল আমজনতার অধিকার। বিজ্ঞানীরাও সভ্যতার বিকাশের জন্য মানুষের উপকারের জন্য নিরলস ও নির্লোভভাবে কাজ করে গেছেন আজীবন। ইতিহাস সেইসব মহৎপ্রাণকে আজও স্মরণ করে পরম শ্রদ্ধায়। সময় বদলেছে, বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ মুনাফামুখী হয়ে পড়ছে দিনকে দিন। বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এখন কর্পোরেট সম্পত্তি। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো এখন বৈজ্ঞানিক নিয়োগ দেয়। আবিষ্কার করে নতুন নতুন সামগ্রী বা ডিজাইন বা কলাকৌশল। যেগুলো ঐ কোম্পানির পণ্য হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি লাভ করে।

প্যাটেন্ট ও প্যাটেন্ট আইনের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় দেখা যায় যে, এ সমস্ত কার্যকলাপে শুধু উন্নত দেশসমূহই সম্পৃক্ত ছিল। এবং এ নিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে আলোচনা, সমঝোতা ও চুক্তি করার ভিন্ন ফোরাম ছিল। এক্ষেত্রে World Intellectual property Organization (WIPO) ছাড়াও জাতিসংঘ ও আঙ্কটাড কথা বলেছে বিভিন্ন সময়। তবুও উন্নত দেশগুলো এ বিষয়টিকে বিশ্ববাণিজ্য চুক্তির আওতায় এনেছে। এর প্রধান কারণ হল, যদি কোনো দেশ শিল্পোন্নত দেশের কোনো কোম্পানির বুদ্ধিজাত সম্পত্তির অধিকার খর্ব করে তাহলে অনায়াসেই শাস্তি দেয়া যাবে। কারণ যেসব দেশ বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার চুক্তিতে স্বাক্ষর করবে তাদেরকে অবশ্যই এ সম্পর্কিত সব চুক্তি মেনে চলতে হবে। অন্যথায় এক খাতের পরিবর্তে আরেক খাতে নিষেধাজ্ঞার আওতায় প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ তো রইলোই।

বাংলাদেশসহ অনুন্নত দেশসমূহ এখনও উদ্ভিদ, গাছগাছড়া, প্রাণী, অণুজীবসহ অন্যান্য প্রাণ বৈচিত্র্যের বিপুল সম্ভার। কৃষি এ সমস্ত দেশে তথাকথিত শিল্প হিসেবে বিকশিত না হলেও প্রথাগত ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও অধিকাংশ মানুষের জীবিকার একমাত্র মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। প্রাণ সম্পদের ওপর নিজস্ব মালিকানা বা অধিকার বলতে কখনো কিছু ছিল না। তাই কৃষিতে বুদ্ধিজাত সম্পত্তির অধিকার বলবৎ নেই। প্রথম গ্যাট চুক্তির মাধ্যমে কৃষি বাণিজ্যিকীকরণ ও প্রাণ সম্পদের ওপর বুদ্ধিবৃত্তীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হল।

ফলে আমাদের কৃষকের নিজের বলে কিছু থাকল না। না বীজ, না কৃষি প্রযুক্তি। অথচ কৃষির সেই সৃষ্টিলগ্ন থেকে কৃষক তার নিজস্ব প্রক্রিয়ায় নতুন নতুন শস্যের আবাদ, বীজ সংরক্ষণ, নয়া কৃষি প্রযুক্তির উদ্ভাবন ইত্যাদি করে আসছে।

এর ফলে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক নির্ভর চাষাবাদের ফলে একদিকে নিজেদের পরিবেশ এবং প্রাণবৈচিত্র্য যেমন ধ্বংস হচ্ছে। তেমনি উচ্চহারে ভর্তুকির ফলে খালি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় কোষাগার।

গুটিকতক শস্য বা উফসী জাতীয় ধানের চাষাবাদের ফলে খালি ধানের ওপর নজর আবদ্ধ রাখা হচ্ছে। কৃষির আধুনিকায়নের ফলে মাছ ও

ডব্লিউটিও আগ্রাসী নীতি ঃ সুপ্রের প্রতিবাদ

বিশ্বায়ন ও উদার বাণিজ্যিকীকরণের নামে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা অনুন্নত দেশগুলোর প্রতি আগ্রাসী মনোভাব পোষণ করছে। আগামী ৩১ মে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে স্বল্পোন্নত দেশ এলডিসির সম্মেলন। এ সম্মেলনকে সামনে রেখে ডব্লিউটিও অনৈতিক আচরণের প্রতিবাদে সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করছে। সুপ্রের উদ্যোগে আগামী ৩০ মে মুক্তাঙ্গন থেকে পল্টনে বিভিন্ন এনজিও, সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। সুপ্র'র উদ্যোগে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ৩১ মে শহীদ মিনারে ঔষধি গাছের প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতির অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। পহেলা জুন এলজিইডি মিলনায়তনে জাতীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে।

জাতীয় জাদুঘর প্রাঙ্গণ থেকে ২ জুন মিছিল বের হবে। কর্মসূচি প্রসঙ্গে সুপ্রের সেক্রেটারি রেজাউল করিম চৌধুরী ২০০০কে বলেন, ডব্লিউটিও আগ্রাসী তৎপরতার কারণে আজ আমাদের শিল্প, কৃষি এমনকি জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হবার দ্বারপ্রান্তে। সরকারগুলো দেশের জনগণকে না জানিয়ে তাদের সঙ্গে দেশের স্বার্থবিরোধী চুক্তি করে চলছে। কখনো ডব্লিউটিও চুক্তি করতে বাধ্য করাচ্ছে। আমরা আমাদের কর্মসূচির মাধ্যমে ডব্লিউটিওর ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করতে চাই। জানা গেছে, সুপ্রের এ কর্মসূচি সফল করতে অ্যাকশন এইড, নেটজ বাংলাদেশ, ক্রিশ্চিয়ান এইড, অক্সফেম জিবি সহযোগিতা করছে। তাদের এ কাজে অন্য যারা সহ-সংগঠক হিসেবে কাজ করছে উবিনীগ, অধিকার, কোয়ালিশন অব আরবান পুওর, কনজুমার অ্যাসেসিয়েশন অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতি, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন, সেন্টার ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, কর্মজীবী নারী ও সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট। তথ্য দিয়ে সহায়তা করছে ইনসিডিন বাংলাদেশ।

Down with
U.S.
Imperialism

বাণিজ্যিক বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের বিরুদ্ধে গড়ে উঠছে জনমত

কুড়িয়ে পাওয়া অন্যান্য খাদ্যের যে সর্বনাশটা হয়ে গেছে তার হিসাব আমরা করছি না।

ডব্লিউটিও : অনুন্নত দেশের শিল্পায়নে প্রতিবন্ধকতা

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, বিশ্বায়নের চাপে বাংলাদেশে শিল্প বিকাশের সম্ভাবনা কাঠামোগতভাবে রুদ্ধ হয়েছে। ত্বরান্বিত হয়েছে বিশ্বায়ন এবং পরিপুষ্ট হচ্ছে অনুৎপাদনশীল খাত এবং নিকৃষ্ট পুঁজির বিকাশ। গত ৩০ বছরে জাতীয় উৎপাদনে শিল্পের অবদান বাড়েনি বললেই চলে, মাত্র ৮%-১০%। শিল্পখাতের যেসব অংশে অপেক্ষাকৃত প্রবৃদ্ধি ঘটেছে সেগুলো আদৌ শিল্পখাত কিনা ভেবে দেখতে হবে। কারণ মৌলিক শিল্প যেমন জয়দেবপুরের মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি অথবা চট্টগ্রামের ইস্পাত কারখানা ও জিএম প্লান্টসহ দেশীয় কাঁচামালনির্ভর হালকা শিল্প যেমন তৈরি পোশাক শিল্প অথবা জানালার গ্রিল বানানোর কারখানা অথবা প্রযুক্তি হস্তান্তরের নামে গছিয়ে দেয়া পরিবেশ বিপর্যয়কারী শিল্প (উদহরণস্বরূপ, হঠাৎ করে বৃদ্ধি পাওয়া সিমেন্ট শিল্প, ইউরোপে এই শিল্প নিয়ে পরিবেশবাদীরা সোচ্চার) বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ হালকা, ভাসমান শিল্পাখাতসমূহে মূল্য সংযোজন ও সামাজিক উপযোগ অত্যন্ত কম, যা সুদৃঢ় অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি নির্দেশ করে না। শিল্প বিকাশের বিপরীতে দ্রুতগতিতে যা বাড়ছে তা হলো সেবাখাত। যেখানে জমি-সম্পত্তি ক্রয়, নির্মাণ কাজ, রিয়েল এস্টেটসহ বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা মিলে এ খাত তৈরি হয়েছে যা জাতীয় উৎপাদনে ৫০% অবদান রাখছে। টাকাওয়ালারা উৎপাদনশীল শিল্পে বিনিয়োগের পরিবর্তে রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা, নির্মাণকাজ এগুলোতে বেশি বিনিয়োগ করেন।

ফলে উৎপাদনশীল কৃষি ও শিল্প দুটি খাত বিকশিত না হয়ে তার স্থলে জায়গা দখল করেছে অনুৎপাদনশীল সেবা খাত। তাতে বিকশিত হলো নিকৃষ্ট পুঁজি যেখানে বিনিয়োগ বাড়বে কিন্তু উৎপাদনশীল বিনিয়োগ স্থবির হয়ে যাবে। এর সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে বিদেশী সাহায্য নির্ভরতা, কালো টাকার দাপট এবং এসবের সহায়ক রাজনৈতিক কাঠামোর।

বাংলাদেশে শিল্পের ইতিহাস পুরনো নয়। পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পজাত পণ্যের সংরক্ষিত বাজার হিসেবে বিবেচনা করা হতো পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শোষণ-শাসন। তারপরও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শিল্পখাতের বেসরকারি শিল্প কারখানার ৪৩ শতাংশ পুঁজির মালিকানা ছিল অবাঙালি। পূর্ব পাকিস্তানের আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পখাতের মোট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি ১৯৭০ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহৎ পুঁজির নিয়ন্ত্রণে যে শিল্পখাত গড়ে ওঠে তা তাদের জন্য লাভজনক ছিল। স্বাধীনতার পর তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী তখনকার রাজনৈতিক প্রয়োজনে জাতীয়করণ কর্মসূচি ঘোষণা করে। জাতীয়করণ করার ফলে ৭টি সংস্থার অধীনে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতই হয়ে দাঁড়ালো শিল্পের মূলধারা। রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের মূলধারা বিভিন্ন কারণে বিকাশ লাভ করেনি। এর পেছনের কারণসমূহ হলো দুর্নীতি, লুটপাট, অদক্ষতা, স্বজনপ্রীতি, প্রয়োজনাতিরিক্ত নিয়োগ, শ্রমিক রাজনীতির নামে জবরদস্তি দলীয়করণ। ১৯৭৫-এর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর বেসরকারি খাতকে আর রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের নীতি ঘোষিত হয়।

১৯৮০ সালে বাংলাদেশকে আইএমএফের Extended Fund Facility (EFE) স্বল্পমেয়াদি ঋণ মঞ্জুর করে। এ ঋণের শর্ত হিসেবে আইএমএফ বাংলাদেশের বাজেট প্রণয়ন নীতিতে, বৈদেশিক মুদ্রা হারে এবং বৈদেশিক বাণিজ্যনীতিতে অনেকগুলো পরিবর্তনের সুপারিশ করে। সবগুলো নীতি সরকার আইএমএফের মর্জিমাফিক করতে না পারায় ১৯৮১ সালের মার্চ মাসে ৮০০ বিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুত ঋণের মধ্যে মাত্র ২০ মিলিয়ন ডলার প্রদানের পর আইএমএফ EFE কর্মসূচির আওতায় ঋণ প্রদান স্থগিত ঘোষণা করে।

সাধারণভাবে বলা যায় যে, ১৯৮০-র দশক ও তার পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের শিল্পায়ন ও সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এইড কনসোর্টিয়াম, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ প্রধান অভিভাবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। আশির দশকের শেষ দিকে বিশ্বব্যাপী চরম আদর্শিক বিভ্রান্তির সুযোগ নিয়ে তথাকথিত বাজার অর্থনীতি প্রবর্তনের প্রেসক্রিপশন হিসেবে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি Structual Agjustment Program (SAP) ঘোষণা করে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর পতনোন্মুখ পরিকল্পিত অর্থনীতিগুলোর পুঁজিবাদী রূপান্তরের জন্য একটি 'সর্বরোগহরা সমাধান' হিসেবে এ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

সামরিক শাসন কাঠামোর মধ্যে ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত পনেরো বছরে সাহায্য এসেছে আনুমানিক ৯৩,০০০ কোটি টাকার সমমানের। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো এই যে, সামরিক শাসিত কাঠামোর মধ্যে ১৯৭৫-১৯৯০ কাল পর্বেই আমাদের পুরো রাষ্ট্রযন্ত্রটি আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থা ও দাতা সংস্থাগুলোর কঠোর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এই সময়েই সমগ্র অর্থনীতি এইড কনসোর্টিয়ামের অধীনস্থ হয়ে পড়ে। আইএমএফ বাংলাদেশে ব্যাংক ভবনের ভেতরে বসে সরাসরি তদারকি শুরু করে। মন্ত্রণালয়সমূহে বিশ্বব্যাংকের উপদেষ্টা নিযুক্ত হতে থাকে। বিশ্বব্যাংক তাদের ঢাকা অফিসে বসে অর্থনীতি পলিসি সমন্বয় করতে থাকে। ১৯৯০ সালে সামরিক শাসনের আনুষ্ঠানিক পতন ঘটলেও এর আগের ১৫ বছরে কনসোর্টিয়াম নির্ভর যে অর্থনীতি ভিত গেড়েছে তাতে তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। এখন আমাদের রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রক হলো এইড কনসোর্টিয়াম। এমনকি উন্নয়নে কোন খাত কতটুকু অগ্রাধিকার পাবে সে বিষয়টিও তারাই নির্ধারণ করেন। পুরো বাজেট প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ তাদেরই কব্জাগত। তারাই নিয়ন্ত্রণ করেন ব্যাংকিং সংস্কার। এ কারণে থমকে গেছে শিল্পের বিকাশ। বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একের পর এক শিল্প কারখানা। এ কারণে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ সর্বোপরি ডব্লিউটিওর ভূমিকা নিয়ে অনুন্নত বিশ্বে বিরূপ ধারণা বেড়েই চলছে।

মূলত আজ সারা অনুন্নত বিশ্বে ডব্লুউটিও কার্যক্রমে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। সচেতন বিবেকবান মানুষ তাকিয়ে রয়েছে ডব্লুউটিও কানকুন মিনিস্টিরিয়াল সম্মেলনের দিকে। এ সম্মেলনে যাতে তৃতীয় বিশ্বের স্বার্থবিরোধী চুক্তি গৃহীত না হয় তার জন্য তারা সজাগ। সজাগ এ দেশের সচেতন মানুষও।

প্লান্ট ভ্যারাইটি অ্যাক্ট : কৃষকের না ব্যবসায়ীদের স্বার্থে

ডব্লিউটিওর আর্টিকেল ২৭.৩ (বি) অনুসারে দেশসমূহকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের ভেতরে হয় নিজস্ব অনুসারে প্রাণ সম্পদের ওপর প্যাটেন্ট রাইট আইন করতে হবে, অথবা ডব্লিউটিওর ঐ ধারা বা প্যাটেন্ট রাইটস বলবৎ হবে। প্রাণ সম্পদ বলতে গাছপালা, বীজ সকল মাইক্রো অর্গানিজমকে (সংজ্ঞানুসারে মানুষকেও ধরা যায় বটে) বোঝানো হয়েছে। আশপাশের দেশ ভারত, থাইল্যান্ড, ফিলিপিনসহ অনেক দেশ ইতিমধ্যে এই আইন করে ফেললেও আমাদের দেশে এই আইন করার ব্যাপারটি রাজনৈতিক প্রতিহিংসাসহ ব্যবসায়ী চক্রের কবলে পড়ে গেছে।

বিগত সরকারের আমলে এ ধরনের আইন প্রণয়ন করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। যারা বিশেষ করে কৃষক সম্প্রদায়ের হাজার বছরের লালিত চর্চাকৃত ও আবিষ্কৃত জ্ঞানগুলো প্রটেকশন দিয়ে খসড়া আইন করে। যা আইন মন্ত্রণালয়ে মতামতের জন্য পাঠানো হয়েছিল। নতুন সরকার আসার পর পূর্বতন কমিটির প্রচেষ্টা চাপা পড়ে যায়। ইতিমধ্যে সরকার ইউরোপীয় ইউনিয়নে এ ধরনের একটা চুক্তিতে স্বাক্ষর করে, যাতে উল্লেখ আছে বাংলাদেশ প্যাটেন্টস রাইটসের যে আইনই করুক তা যেন কোনোভাবেই উন্নত দেশসমূহের প্যাটেন্টস আইনের বিরোধাত্মক না হয়। ইতিমধ্যে সরকার শোনা যায় FAOতে পরামর্শদাতা এনে ঐ ধরনের আরেকটি খসড়া প্রণয়ন করেছে, যাতে মূলত বিদেশী ও বিদেশী বীজ কোম্পানিগুলোর স্বার্থকে দেখা হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয় আগামী জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে এ বিষয়ে মতবিনিময়ের জন্য একটা সভা ডেকেছে, যেখানে আমন্ত্রিত হয়েছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বীজ ব্যবসায়ী কোম্পানি ও এনজিওরা।